# রোজগারহীনদের জন্য কাজের ব্যবস্থাই হোক উন্নয়নের আপাতত লক্ষ্য

**রবীন চক্রবর্ত্তী**

কেন্দ্রীয় সরকার এক নাগাড়ে 'ইকনমিক গ্রোথক্স - এর কথা বলে চলেছে। জিডিপি (GDP) বাড়ছে, তাতেই খুশি। কিন্তু প্রশ্ন সেটাই কি সব? জিডিপি মানে দেশে এক বছরে পণ্য এবং সেবা হিসেবে যা কিছু উৎপাদন হয়েছে টাকার অঙ্কে তার মূল্য। এই উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবা কাদের ভোগে লাগল তা এই অঙ্কের মধ্যে লেখা নেই। স্বভাবতই যাদের পকেটে রেস্ত আছে তারাই ভোগ করছে। যাদের নেই তারা দর্শক। ফলে জিডিপি বাড়লে দরিদ্র মানুষদের কিছু এসে যায় না। এই অঙ্ক দিয়ে উন্নয়নের হিসেব বোঝা যায় না। সমাজের সব অংশের মানুষ এর সুফল পাচ্ছে কিনা বোঝা যায় না। বোঝা যায় না দরিদ্র মানুষদের দুর্দশা কাটছে কিনা। তথাপি কেউ জানে না। তাই এদের জন্য আলাদা করে অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অর্থে কাজ নেই যাদের, তাদের হাতে কাজ দিতে হবে। ভিক্ষে হিসেবে নয়, শ্রমের বিনিময়ে তারা পাবে সেই অর্থ। ভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে লাগানো হবে তাদের শ্রম। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষের কাছে উন্নয়নের বস্তুগত প্রয়োজন আলাদা। যে খেতে-পরতে পাচ্ছে তার প্রয়োজন আর যে পাচ্ছে না তার প্রয়োজন এক নয়। যারা পাচ্ছে না তাদের জন্য ভাবনাই উন্নয়নের আপাতত লক্ষ্য হোক।

**এক সময় উন্নয়নের মানে ছিল খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান .........!!!**

আগে সাধারণ মানুষ উন্নয়ন বলতে বুঝত সরকার তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। এই ব্যবস্থা কে কতটা পারল সেই অনুযায়ী মানুষ সরকারের ভালমন্দ বিচার করত। সেসব সংজ্ঞা এখন বাতিল। শিল্পায়নের ঢাকের বাদ্যির আড়ালে উন্নয়নের অর্থটাই বদলে দেওয়া হয়েছে।

***ব্যাপারটাকে পরিবারের অর্থনীতির মত করে দেখলে চলবে না। দেখতে হবে গোটা দেশের হরেক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিরিখে। এই যোজনার মাধ্যমে ব্যয়িত অর্থ সুষ্ঠু ভাবে কাজে লাগাতে পারলে শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, নানান ভাবে ফিরে আসবে তা। এই কথাটাই মাথায় রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্থানীয় উৎপাদন-অর্থনীতির চাকাটা একবার ঘুরতে শুরু করলে এর আর্থিক ও সামাজিক সুফল পেতে দেরি হবে না।***

জিডিপি নিয়েই সোরগোল চলচে। বলা হচ্ছে দ্রুত শিল্পায়ন মানে দ্রুত উন্নয়ন। এজন্য দেশি বিদেশী বিনিয়োগকারি ব্যবসায়ীদের খাতির করে ডেকে আনা হচ্ছে। গরীব মানুষদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় বিনি পয়সায় জল ও বিদ্যুত দেওয়া হচ্ছে। ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো কত কী দেওয়া হচ্ছে জানা নেই। সেসব ট্রেড-সিক্রেট। রাজ্যে রাজ্যে এমন জমি দখল আর ছাড়ের প্রতিযোগিতা চলছে। এই লুঠপাটের নাম দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন।

দরিদ্র মানুষদের ভাগ্য এই ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার হাতে ছেড়ে রাখলে কতদিনে এদের অবস্থার পরিবর্তন হবে

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভার ক্রমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক সংস্কারের নামে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির বন্দোবস্ত করার কাজ থেকে সরে আসছে সরকার। আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইত্যাদির আর্থিক নির্দেশ মত সেই অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন শহর গড়ে তোলা হচ্ছে। পুরনো শহর নতুন করে

সাজানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে এসব হল 'বিনিয়োগ - বন্ধু' পরিবেশের অঙ্গ। এসব না থাকলে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীরা এখানে টাকা লগ্নী করবে না। লগ্নী না হলে শিল্প কারখানা হবে না। তাহলে উন্নয়নও হবে না। এই তাদের যুক্তি। এর ফলে দেশে ক্রোড়পতির সংখ্যা বাড়ছে। সে খবর পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। দেশ উন্নত (!) হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তা সত্বেও দরিদ্রের সংখ্যা কেন বাড়ছে এই ধাঁধাঁর উত্তর পাচ্ছি না।

### সরকারের হাতে টাকা নেই, উন্নয়নের জন্য টাটা আম্বানীরাই ভরসা

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, গুজরাটের বিজেপি সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বাম তথা সিপিএম সরকার, সকলেই এই উন্নয়ন উদ্যোগের শরিক। সবার এক সুর। উন্নয়ন মানে টাটা, আম্বানী, সালেম, জিন্দাল, মিত্তালদের সুবিধে দিয়ে ডেকে আনা। যুক্তি হল সরকারের হাতে টাকা নেই। তাই তাদের ডেকে আনতে হচ্ছে। তারা কারখানা বানাবে, রাস্তা বানাবে, ব্রিজ বানাবে, শহর বানাবে, ব্যবসা করবে। এতেই উন্নয়ন হবে। কারণ কলকারখানা হলে তার জন্য শ্রমিক লাগবে, ইঞ্জিনীয়ার-ম্যানেজার-ক্লার্ক লাগবে, হিসাব-রাখার লোক - সিকিরিউটি গার্ড - ক্যান্টিনবয় লাগবে, কমপিউটার জানা এবং এমন আরো অনেক ধরনের কাজের লোক লাগবে। লোকের চাকুরি হবে। (অবশ্য ক'টা চাকুরি হবে তা নিয়ে আছে ঘোরতর সন্দেহ।) রোজগার হবে। রোজগারের টাকায় বাজার থেকেই সব কিনে নেওয়া যাবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য - কী চাই? সবই বাজারে থাকবে। কিনে নিলেই হল। চাকুরি করছেন বা করছেন না, সক্কলেই কিনে নিতে পারবেন!

### এই উন্নয়ন চুঁইয়ে একদিন পৌঁছে যাবে আমলাশোল!

এই উন্নয়নপন্থীদের দাবী যে এইভাবে চলতে থাকলে এর সুফল এক সময় দেশের সব থেকে নীচের তলার মানুষ অবধি পৌঁছে যাবে .....! কীভাবে নীচের দিকে চোঁয়াবে, এতদিনেও কেন চোঁয়ালো না বা কতদিনে চোঁয়াবে সেসব প্রশ্নের উত্তর নেই। শুধু তাদের এই বিশ্বাসটায় আমাদেরকেও বিশ্বাস রাখতে বলা হচ্ছে। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাচ্ছে না। প্রশ্ন তুললে বলা হচ্ছে এরা উন্নয়ন বিরোধী!

### কে বলেছে উন্নয়ন হচ্ছে না?

হ্যাঁ, দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে। একথা মানতেই হবে। এই বৃদ্ধির হার পৃথিবীর অনেক দেশের থেকে বেশি। তাও সত্যি। কিছু মানুষের অবস্থা সত্যি-ই ভাল হয়েছে। তার নানান লক্ষণ দেখছি। যারা শহরে থাকি দেখি। রাস্তায় হরেক মডেলের গাড়ি, পেল্লায় বিলাসবহুল অফিস ও বসত বাড়ি, ঝলমলে শপিং মল, থরে থরে সাজানো দেশি-বিদেশী জিনিষ, সেখানে সুখী মানুষদের ভীড়, এখানে ওখানে ফ্লাইওভার, শহর থেকে শহরে দ্রুত যাতায়াতের জন্য এক্সপ্রেসওয়ে, - এসব অবশ্য-ই উন্নতির লক্ষণ। এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছে না। প্রশ্ন উঠছে এর সুফলভোগী কারা তাই নিয়ে।

### মার্কিন দেশের মোট জনসংখ্যার থেকে বেশি মানুষ এদেশে অনাহারে থাকে

প্রশ্ন হল দেশের কতজন মানুষ এই উন্নতির অংশীদার? দেশের অর্দ্ধেক মানুষও কী? - না, তা নয়। ছিঁটেফোঁটা সুবিধাভোগ অবধি ধরেও খুব বেশি হলে দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ এর সুফলভোগী। বেশির ভাগই এর বাইরে পড়ে থাকছে। সংখ্যার হিসেবে বাহাত্তর থেকে তিয়াত্তর কোটি মানুষ তারা। এদের মধ্যে একদম নীচের দিকে প্রায় তিরিশ - বত্রিশ কোটি মানুষের অবস্থা ভয়ঙ্কর রকম খারাপ। এতটাই খারাপ যে বছরের অনেকটা সময় তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হয়। তাদের হাতে কাজ থাকে না তাই। সংখ্যাটা কত বড় বোঝানর জন্য জানাই যে এই সংখ্যাটা মার্কিন যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি!

### শিল্পের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে দরিদ্রদেরই

আর্থিক সংস্কারের নামে একদিকে সামাজিক সুরক্ষার সুযোগগুলি উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে কল কারখানা শহর বন্দর সেজ রাস্তা পার্ক ইত্যাদি নির্মাণের নামে দরিদ্র মানুষদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উন্নয়নের

জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে দরিদ্র মানুষজনদেরই। যারা এর সুফলের ভাগীদার নয়। শিল্প কারখানার জন্য পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যও দিতে হয় তাদেরই। একটি দৃষ্টান্ত। দেশ জুড়ে পানীয় জলের সমস্যা। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে বোতল - ভর্তি জল। এজন্য গ্রামে গঞ্জে কারখানা বসছে। মাটির তলা থেকে হাজার হাজার গ্যালন জল টেনে তোলা হচ্ছে। সেই জল বোতল ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে শহরাঞ্চলে। এদিকে গ্রামে মাটির নীচে জলের তল নেমে যাচ্ছে। কারখানা - ঘিরে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। সেখানকার মানুষ পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করে মরছে!

### আধুনিক প্রযুক্তির পরিণতি 'জবলেস গ্রোথ'

যে চাকুরির দোহাই পেড়ে এত সব কান্ড, সেই চাকুরির ব্যাপারটাও বেশ গোলমেলে। বিনিযোগ বাড়ছে। শিল্প, কল-কারখানা, রাস্তাঘাট, অফিস-বাড়ি, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়ছে। সামন্যই বাড়ছে। অন্যত্র কমছে। এত কমছে যে নীট হিসেবে কর্মসংস্থান কমছে। ইস্পাত কারখানায়, গাড়ি কারখানায়, সিমেন্ট কারখানায়, টেলি-যোগযোগ ব্যবস্থায়, খনি-শিল্পে, রাস্তা তৈরিতে, ব্রিজ তৈরিতে, সর্বত্র এক চিত্র। টাকা বিনিযোগ হচ্ছে, উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ছে না। একেই বলে 'জবলেস গ্রোথ'। একটি দৃষ্টান্ত। জামশেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানায় ১৯৯১ সাল থেকে দশ বছরে উৎপাদন বেড়েছিল পাঁচ গুণ। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেই কর্মীসংখ্যা কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছিল।

আধুনিক কল কারখানা মানেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্ভর ব্যবস্থা। একটি সিমেন্ট কারখানার এক সময় হাজার খানেক লোক কাজ করত। আজ সেই মাপের কারখানাই শত খানেক লোক দিয়ে চলে। গাড়ির কারখানায় অনেক কাজই আজ স্বয়ংক্রিয় রোবটের সাহায্যে করা হয়। এমন কী রাস্তা তৈরীর মত মোটা দাগের কাজও বড় বড় যন্ত্রপাতি লাগিয়ে কম লোক দিয়েই হয়ে যাচ্ছে। এবং শত শত মাইল রাস্তা অতি অল্প সময়ে তৈরী হয়ে যাচ্ছে। একই কাজ যন্ত্রের বদলে বেশি মানুষ লাগিয়েও হতে পারত। কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। এখন সময়ের অনেক দাম। সময় বেশি লাগা মানে লাভের অঙ্ক কমা। সেটা হতে দেওয়া যায় না। ফলে প্রচুর বিনিয়োগের হিসেব কষে লাভ নেই। প্রচুর বিনিয়োগের সাথে চাকুরির গল্পের কোনো যোগ নেই। ঘটনা হল গত দেড় দশক ধরে এদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎপাদনের নানান খাতে বিনিয়োগ সত্ত্বেও ১৯৯৮ সালের পর থেকে গোটা দেশে কলে-কারখানায় মোট কর্মীসংখ্যা কমে গেছে। সরকার প্রকাশিত তথ্যই একথা বলছে।

### দেশের লোকে চাকরি পাবে এজন্য শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করে না

দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারিরা আসছে। কলকারখানা হচ্ছে। উৎপাদন হচ্ছে। সেই পণ্য দেশের লোক কিনতে পারল কিনা দেখার দরকার নেই। গোটা দুনিয়াটাই তাদের বাজার এখন। সেখানকার লোক কিনতে পারে সেখানেই সে বেচবে। এটাই হিসেব। এতেই সমস্যা হচ্ছে। দুনিয়ার বাজারে সে একা নয়। তার মত অনেকেই আছে সেখানে। ফলে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে হলে পণ্যের দাম কমাতে হয়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে হয়। কমানর একটাই রাস্তা। মজুরি খাতে ব্যয় কমান। মানে কম লোক দিয়ে বেশি কাজ করান। সেটাই করছে ব্যবসায়ীরা। সেটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যাচ্ছে বিনিয়োগ বাড়ছে, শিল্প - কলকারখানা বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে। মানুষের চাকুরি বাড়ছে না। রপ্তানী কেন্দ্রিক উৎপাদন হলে এটাই হবে। দেশের লোক কাজ হারাবে। লোকের আয় কমবে। দেশের বাজার আরও সংকুচিত হবে। উৎপাদনকারিদের বেশি করে রপ্তানী বাজারের পিছনে ছুটতে হবে। এ এক গভীর গাড্ডা। সরকার বিনিয়োগকারিদের যতই সুবিধে দিয়ে তোয়াজ করে ডেকে জিডিপি বাড়ানোর উদ্যোগ নিন না কেন, এতে মালিকদের সিন্দুক ভরবে। কিন্তু ওই সম্পদের সামান্যই দরিদ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবে।

এই অবস্থায় কী করা দরকার সেটাই ভাববার বিষয়। এই মুহূর্তে এমন কোনো শক্তি নেই যে উন্নয়নের এই ধারাকে প্রতিহত করে। ফলে দেশের পঁচিশ ত্রিশ শতাংশ মানুষকে নিয়ে উন্নয়নের এই ধারা আপাতত অব্যহত থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ব্যবস্থা বদলানর জন্য কঠিন রাজনৈতিক লড়াই এর প্রয়োজন। সে চেষ্টা চালাচ্ছে অনেকে। সে লড়াই চলতে থাকবে। এখনই শেষ হবার নয়। এই অবস্থায় ভেবে দেখা দরকার যে উন্নয়ন কেমন হলে উন্নয়নের উদ্যোগ সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষ অবধি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিভাবে দরিদ্রতম অংশের মানুষকে এর অংশীদার তো বটেই, পরিচালকও করে নেওয়া যায়।

**দরিদ্রদেরও সামিল করা যায় উন্নয়নের উদ্যোগে**

এই নিয়ে ভাবছেন কেউ কেউ। এর জন্য সম্ভাব্য একটি উন্নয়ন কর্মসূচির কথা বলেছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিত ভাদুড়ী। ''ডেভেলপমেট উইথ ডিগনিটি - এ কেস ফর ফুল এমপ্লয়মেন্ট সোসাইটি'' নামের বইটিতে। তিনি দেখিয়েছেন যে চাইলে দরিদ্রতম অংশের মানুষদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে নেওয়া যায়। এই উদ্যোগে অংশীদার করা যায়। তিনি বলেছেন দেশের দরিদ্রতম অংশের মানুষের হাতে কাজ জুটিয়ে দিতে হবে। ন্যূনতম মজুরিতেই। এই শ্রম গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে লাগাতে হবে। এর থেকে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে সেটা গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনবে তাতেই ফের নতুন নতুন কর্মসংস্থান হবে। নীচ থেকে শুরু হবে উন্নয়ন।

**গরীবদের জন্য আলাদা বাজার আলাদা অর্থনীতি**

আসলে যেটা বলা হয়েছে তা হল সাময়িক লক্ষ্য হিসেবে হলেও মানুষদের ঘিরে তাদের মত করেই একটা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কথা ভাবা দরকার। যেখানে তাদের আশু প্রয়োজনগুলিকে ঘিরেই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হবে, তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও বাজার গড়ে উঠবে। গ্রামের মানুষদের হাতে কাজ জুটিয়ে দিতে পারলে তাদের রোজগারের টাকা নিয়ে তারা ক্রেতা হিসেবে বাজারে ভীড় করবে। নতুন করে চাহিদা সৃষ্টি হলে সেই চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থাও গড়ে উঠবে। ছোট আকারের সেই উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়েই সেই চাহিদা পূরণ করা যাবে। ছোট আকারের উৎপাদন ব্যবস্থা মানে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মানুষের যুক্ত হওয়া। আধুনিক বড় শিল্পে যেখানে গড়ে এক কোটি টাকা বিনিয়োগে গুটি কয়েক চাকুরি হয়, সেখানে ক্ষুদ্র বা কুটিরশিল্পে ওই টাকায় এক'শর বেশি লোকের কাজ জুটতে পারে। এই প্রক্রিয়াটিকেই সক্রিয় করে তুলতে হবে।

গরীবদের মত করে একটা বাজার-অর্থনীতি আমাদের দেশে সব সময়ই ছিল। এখনও আছে। গরীব মানুষদের হাতে কাজ জুটলে, তাদের রুজি রোজগার একটু বাড়লে সেই বাজারটাই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেটাই আপতত লক্ষ্য হওয়া উচিত। অগ্রগতির একটা স্তর হিসেবে এটাকে দেখতে হবে। গরীবদের বাজার প্রসারিত হলে বৃহৎ পুঁজি এক সময় সেই বাজারের দখল নেবার জন্য এগিয়ে আসতেই পারে। কিন্তু সেটা এক্ষুণি হচ্ছে না। তার জন্য সময় লাগবে। এই নিয়ে এখুনি ভাবনার প্রয়োজন নেই।

**জাতীয় গ্রামীন রোজগার সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প - একটি সুযোগ**

অধ্যাপক ভাদুড়ীর মতে এই প্রক্রিয়া শুরু করার একটা সুযোগ উপস্থিত এখন। ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট নামে একটি আইন চালু করেছে ভারত সরকার। যাতে দেশের দরিদ্রতম অংশের মানুষের জন্য ন্যূনতম মজুরিতে বছরে অন্তত একশ দিন কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর জন্য টাকা যা লাগবে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। গ্রামে দরিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষদের জন্য এই প্রকল্প। আইনটি বলবৎ হয়েছে ২০০৫ সালে। প্রথমে দেশের সব থেকে পিছিয়ে পড়া কিছু জেলাতে চালু হয়। তারপর এই বছর থেকে গোটা দেশেই চালু হয়েছে।

এই প্রকল্পটি কার্যকর হলে গ্রামের দরিদ্র মানুষজন অন্তত একক্সশ দিন কাজ পেতে পারবে। তিন বছর হল এই

প্রকল্প চালু হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্প কার্যকর করার আন্তরিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ রাজ্যই এই প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে দরিদ্র মানুষদের হাতে কাজ জোটানর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি। বোঝাই যায় এই অনাগ্রহের পেছনে কায়েমি স্বার্থের হাত আছে। গ্রামে চল্লিশ টাকা দৈনিক মজুরিতেও লোক পাওয়া যায়। সরকারি প্রকল্পের কাজে সত্তর আশি টাকা মজুরি দেওয়া হবে। তাহলে কাজের লোক সব সেখানেই চলে যাবে। সস্তায় মজুর সাপ্লাইয়ে টান পড়বে। গ্রামের কায়েমি স্বার্থ তাই এই প্রকল্প বানচালের চেষ্টা করবে, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যদি এই প্রকল্প কার্যকর করা যেত এবং আগামী দিনে এক' শ দিনের জায়গায় সারা বছরের জন্য কাজের গ্যারান্টি আদায় করা যায়, তাহলে এর ফল সুদূরপ্রসারি হবে। মনে রাখতে হবে এটা এককালীন অনুদান নয়, কাজের গ্যারান্টি। পরোক্ষে মানুষের কাজের অধিকার মেনে নিয়েছে সরকার। আংশিকভাবে হলেও কাজ দেওয়ার দায়িত্বও সরকার নিয়েছে। অন্তত তেমন অঙ্গীকার করেছে। এখন এটা কার্যকর না হলে এই অঙ্গীকার থেকে পিছিয়ে আসতে পারে সরকার। কোনো অজুহাতেই যাতে তারা সেটা না করতে পারে সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। এই নিয়ে জনমত তৈরি করতে হবে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

### টাকা আসবে কোথা থেকে

সরকারের হাতে টাকা নেই এমন ঘোষণা প্রায়ই শোনা যায়। সেই অজুহাতে এই প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরকারের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এই বোঝা তাদের অনন্তকাল বইতে হবে এমন না। যদি একটু ভাবনা চিন্তা করে পরিকল্পনা করে মানুষের শ্রম কাজে লাগান যায় তাহলে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তাতে একসময় মজুরি খাতে খরচ হওয়া টাকা নানান ভাবে উঠে আসতে শুরু করবে। ততদিন কেবল সরকারকে এই দায় বহন করতে হবে। টাকা কোথা থেকে আসবে উত্তরে বলতে হয় সরকার যেভাবে অর্থ সংগ্রহ করে সেভাবেই করবে। ধনীদের এত সুবিধে দিয়ে ফুলেফেঁপে উঠতে সাহায্য করছে সরকার। সেই ধনীদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে টাকা তুলবে। প্রশাসনিক খরচ কমাবে। প্রতিরক্ষা খাতে অর্থহীন খরচ কমাবে।

এই মুহূর্তে এই প্রকল্পের জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটা আমাদের দেশের বাৎসরিক বাজেট অঙ্কের তুলনায় খুব বড় নয়। ধরা যাক তিন কোটি মানুষকে এই প্রকল্পে কাজ দিতে হবে। মাথা পিছু দৈনিক এক' শ টাকা হিসেবে খরচ ধরলে এক'শ দিন কাজ দিতে লাগবে বছরে তিরিশ হাজার কোটি টাকা। আর এই কাজের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের জন্য লাগবে ধরা যাক আরও কুড়ি হাজার কোটি টাকা। মোট পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। আমাদের দেশের পক্ষে টাকাটা খুব বেশি নয়। বর্তমান বছরের মোট বাজেট অঙ্কের মোটামুটি সোয়া ছয় শতাংশের মত। এই তো সেদিন চাষিদের ব্যাঙ্ক-লোন মকুবের জন্য ষাট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। পরে বরাদ্দ বাড়িয়ে পঁচাশি হাজার কোটি করা হয়েছে। কই এর পর তো দেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি!

ব্যাপারটাকে পরিবারের অর্থনীতির মত করে দেখলে চলবে না। দেখতে হবে গোটা দেশের হরেক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিরিখে। এই যোজনার মাধ্যমে ব্যয়িত অর্থ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, নানান ভাবে ফিরে আসবে তা। এই কথাটাই মাথায় রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্থানীয় উৎপাদন-অর্থনীতির চাকাটা একবার ঘুরতে শুরু করলে এর আর্থিক ও সামাজিক সুফল পেতে দেরি হবে না।

### দরকার হলে নোট ছাপাক সরকার

এরপরও অধ্যাপক ভাদুড়ীর পরামর্শ হল যদি একান্তই অর্থের অভাব হয় সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সরকার নোট ছাপিয়েই টাকাটা দিতে পারে। এতে ঘাটতি বাজেট হবে। তা হবে। এতে দেশ রসাতলে যাবে এমন ভাবার কারণ নেই। নোট ছাপানোর কথা শুনে সরকারের পরামর্শদাতা অর্থনীতিবিদরা ঘাবড়ে যেতে পারেন। অধ্যাপক ভাদুড়ী তাদের ঘাবড়াতে মানা করেছেন। তিনি বলছেন এর ফলে মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা যে ঘটবেই তার কোন মানে নেই। দেশে যোগানের অবস্থা যদি

ঠিকঠাক থাকে তাহলে সেটা হবে না। এই মুহূর্তে দেশে উৎপাদন পরিস্থিতি ভালই। কিছু কিছু শিল্প-ক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। দরকার হলে উৎপাদন বাড়ান হবে। তা ছাড়া দরকার পড়লে জিনিষপত্র আমদানি করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার অভাবও নেই আমাদের এই মুহূর্তে।

ঘাটতি বাজেট করার ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে আইনগত বাধার কথা উঠতে পারে। একটা আইন করেছে ভারত সরকার। নাম হল এফ আর বি এম - আইন। পুরো কথা 'ফিস্ক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট। সরকারের তরফে বাজে খরচ বন্ধ করার জন্য এই আইন। আপাতভাবে মনে হবে ভাল উদ্দেশেই করা হয়েছে এই আইন। আসলে করা হয়েছে স্টক মার্কেট - এর কথা ভেবে। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারিদের নিশ্চিন্ত করতে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আই এম এফ - এর মত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাদের খুশি রাখতে। কিন্তু এই আইনের কারণে যদি গরীবদের জন্য তৈরী করা রোজগার প্রকল্পের টাকা বরাদ্দ বন্ধ করতে হয়, তাহলে আমাদের দাবী হবে সরকার এই আইন বাতিল করুক।

**তবে কাজটা হতে হবে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা মাফিক**

সব কিছু নির্ভর করছে প্রকল্পটির সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার ওপর। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের দেশের পক্ষে টাকার থেকেও বড় সমস্যা হল কাজটা ''সুষ্ঠুভাবে'' করা। প্রশাসনের নানান পর্যায়ে রয়েছে দুর্নীতি আর বিভিন্ন স্বার্থের জটিল আবর্ত। তারপর গ্রাম স্তরে নানান বাধা তো আছেই। আছে নানান স্তরের কায়েমি স্বার্থ। আছে দলাদলি এবং তাই নিয়ে রেষারেষি। আছে শিক্ষার অভাব এবং দক্ষ কর্মীর অভাব। কাজ মানে কেবল কোদাল বেলচা মেরে মাটি কাটা তো নয়। নানান ধরনের কাজ করতে হবে। সেজন্য কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই সমস্ত বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে এই উদ্যোগকে সফল করতে হলে কাজের পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

**দায়িত্ব গ্রামের মানুষেরই**

মানুষ নিজের উদ্যোগে যে কাজ গড়ে তোলে, সেই কাজ যত মমতায় এবং উৎসাহের সাথে করে ফরমায়েসি কাজ কখনই সেভাবে করে না। এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনাটাই জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ত কর্মোদ্যোগের প্রেরণাকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য পরিকল্পনা তৈরি করা থেকে রূপায়ণ অবধি সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে মানুষদের হাতেই। দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের পথ ধরেই একসময় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। তবে শুধু কথায় নয়, প্রকৃত অর্থেই এই বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণের নামে খানিকটা দায়িত্ব প্রশাসনের ওপরতলা থেকে নীচের তলায় নামিয়ে দেওয়া নয়। এমন কি স্থানীয় স্তরে শাসক দলের হাতে তুলে দেওয়াও নয়। গ্রামের মানুষের হাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তুলে দিতে হবে এবং সেইভাবেই প্রকল্পের বিধি-নিয়ম স্থির করতে হবে। গ্রামের মানুষ গ্রাম সভার মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করবে এটাই রীতি।

বিধি প্রণয়নের সময় আরেকটি বিষয়ও মনে রাখতে হবে। দেখতে হবে টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর কোনো পর্যায়েই সরকারি আমলাদের খবরদারির কোনো সুযোগ না থাকে। দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ওপর খবরদারির ভার রয়েছে তাদের ওপর। গরীবদের জন্য বরাদ্দ এই কটা টাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাদের ক্ষমতা কমে গেল মনে করার কারণ নেই। গ্রামবাসীদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক টাকাকড়ি লেনদেনের ভার। চুরি-চামারি অপচয় অব্যবহার এই সমস্ত আশঙ্কা সত্বেও ঝুঁকিটা নেওয়া হোক।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাক্তন একজন প্রধানমন্ত্রীর একটি উদ্ধৃতি মনে করা যেতে পারে। তিনি আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন আমাদের দেশে গ্রামের গরীবদের জন্য সরকারি বরাদ্দের প্রতি এক'শ টাকার মাত্র দশ টাকা প্রকৃতপক্ষে গরীবদের হাতে পৌঁছায়! আমলাতন্ত্রের বজ্র আঁটুনি সত্বেও যখন এই অবস্থা, তখন এক্ষেত্রে তাদের নজরদারির অভাবে যদি অবস্থাটা আরও খারাপ হয় তো হোক। এক'শ টাকায় দশ টাকার বদলে

যদি দেখা যায় পাঁচ টাকা পৌঁছচ্ছে, তাহলে তাই হোক। এই চোর তো গ্রামেরই কেউ হবে। তার মোকাবিলা গ্রামের গরীবগুর্বোরা কীভাবে করবে তাদেরকেই বুঝে নিতে দেওয়া হোক।

### কাজ চাওয়াটা দয়া চাওয়া নয়

একজন সরকারি কর্মী কী মনে করে সরকার তার প্রতি দয়াবশত চাকুরিটা দিয়েছে? যে মানুষটি মাস মাইনেতে লোকের বাড়িতে কাজ করে সেও কী মনে করে তার প্রতি কেউ দয়া করছে? সে জানে রীতিমত গতর খাটিয়ে সে রোজগার করছে। এই প্রকল্পে যারা কাজ করবে তাদের মধ্যেও এই বোধটি যাতে কাজ করে দেখতে হবে। কাজ বন্টনের দায়িত্ব নিশ্চয়ই কারো উপর থাকবে। নিয়মকানুন এমনভাবে করতে হবে যাতে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে দয়া দেখান হচ্ছে ভাব না দেখাতে পারে। কড়াকড়ি যা থাকার কাজের হিসেব বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকুক। সেই ব্যাপারে এক'শ শতাংশ কঠোর হওয়ার এক্তিয়ার দেওয়া হোক সেই কর্তৃপক্ষের হাতে। কিন্তু কাজ দেওয়ার ব্যাপারে কোনো আধিকারিকেরই যেন গড়িমসি করার সুযোগ না থাকে দেখতে হবে।

### প্রকল্প কীভাবে বাস্তবায়িত হবে

প্রকল্প বাস্তবায়নের দুটো ধাপ। পরিকল্পনা রচনা এবং তার রূপায়ণ। অর্থাৎ কী কাজ হবে আর কীভাবে করান হবে ঠিক করা। একদিকে সর্বত্রই রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, বনসৃজন, ইত্যাদির মত সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় কাজ থাকবে। অন্যদিকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদ নির্ভর উৎপাদনমুখী কাজকর্মও গড়ে তুলতে হবে। ফলে পরিকল্পনার কাজটা এলাকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই হতে হবে। তবে কত ধরনের কাজ হতে পারে, তাতে কী কী নতুন ভাবনা যুক্ত হতে পারে এই সব সম্পর্কে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা দরকার। দুনিয়াব্যাপী উন্নয়ন উদ্যোগের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সেসব অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। সেই তথ্য জেলা থেকে গ্রামস্তর অবধি পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজ কেন্দ্রীয়ভাবেই করতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। দরকারে এই জ্ঞানকে উন্নত করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন কারিগরিবিদ্যা চর্চা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যায়। এগুলিই হতে পারে গ্রামে উন্নয়ন - উদ্যোগের সহায়ক কেন্দ্র। কাজের মান ঠিক রাখা, অপচয় রোধ করা এসবের জন্যও কারিগরি জ্ঞান দরকার। এই কেন্দ্রগুলি সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

যোজনার টাকা কী পদ্ধতিতে খরচ হবে তা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবা দরকার। টাকা বন্টনের প্রথা প্রকরণের মধ্যেই চুরি-জোচ্চুরি-কারচুপি ইত্যাদির ভূত লুকিয়ে থাকে। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিগত ছিদ্রগুলি আটকাতে হবে। এর পর দেখতে হবে শ্রম দেওয়ার শেষে লোকেদের মজুরির টাকা পেতে না হয়রান হতে হয়। মজুরির টাকা সহজে পাওয়ার বন্দোবস্ত রাখা দরকার। কাজের হিসেব রাখায় কড়াকড়ি থাকুক। কাজ কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেবার ব্যবস্থা থাকুক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজের শেষে মজুরির জন্য না হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় দেখতে হবে। নিয়ম থাকবে কাজের হিসেবে গরমিল বা কারচুপি ধরা পড়লে পরের বার আর টাকা পাওয়া যাবে না। এতেই কারচুপির অনেকটা কমে যাবে। আসলে টাকা হাতে পাওয়ার ব্যবস্থাটা যদি সহজ হয়, তখন টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটা বড় হয়ে উঠবে। তখন কোনো কারণে টাকা না মার যায় সে ব্যাপারেও মানুষ অনেক বেশি সজাগ থাকবে। এর সাথে তথ্য জানার অধিকারের আইনটি কীভাবে কারচুপি বন্ধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সে ব্যাপারেও মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

গ্রাম স্তরে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব তো পঞ্চায়েতের। তারাই করাবে কাজ। কাজ বাছাই, কাজ বিলিবন্টন ও কাজের হিসেব, মজুরির হিসেব - এসব করবে পঞ্চায়েত। গোটা ব্যাপারটা তদারকির ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সাথে গ্রামসভারও সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে। এলাকার জন্য ঠিক ঠাক দরকার মতো কাজ বাছা হচ্ছে কি না, কাজের অগ্রগতি, কাজে গাফিলতি, কারচুপি ইত্যাদির ওপর নজরদারি করা, টাকা পয়সা

ঠিক ঠিক ব্যয় হচ্ছে কিনা দেখা, ঠিক ঠি ক লোক কাজ পেল কিনা দেখা, -এসবের দায়িত্ব নিতে হবে পঞ্চায়েতের সাথে গ্রামসভাকেও। মানে গ্রামের সবাইকেই। মিটিঙে সবাই বসবে, মত দেবে। কিন্তু সবাই করবে কথাটার মানে হয় না। এর জন্য কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রাম সভার প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গড়া যেতে পারে। কিন্তু দায়িত্ব সবার। সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য তথ্য জানার অধিকারের আইন বা সংক্ষেপে আর টি আই আইনটিকে হাতিয়ার করতে হবে। গোটা কর্মকান্ডকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে এই আইন।

**আর টি আই আইন-ই হোক সুষ্ঠু রূপায়ণ ও দুর্নীতি রোধের হাতিয়ার**

তথ্য জানার অধিকার (আর টি আই) আইনটি চালু হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। এই আইনে বলা হয়েছে দেশের সমস্ত সরকারি অপিসে যত কাজকর্ম হয় তার নথিপত্র যেমন সরকারি নির্দেশ, চিঠিপত্র, আধিকারিকের দেওয়া নোট, কাজের খতিয়ান, নির্মাণ কাজের টেন্ডার - অর্ডার, কেনা-কাটার বিবরণ, খরচপত্রের হিসেব কোনো কিছুই গোপনীয় তথ্য নয়। সব তথ্যই চাইলে যে কেউ দেখতে পারে। কাগজপত্র সেভাবেই রাখার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। এমন কী সম্ভব হলে বিশেষ বিশেষ তথ্য অফিসের বাইরে নোটিশ বোর্ডেই টাঙিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। যাতে যে কেউ চাইলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। শুধু দেখতে চাইলে তার জন্য কোনো দরখাস্ত করারও দরকার নেই। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কোনো নথি দেখাব না, বলতে পারেন না। বড় জোর বলতে পারেন এখন ব্যস্ত আছি। অমুক দিন আমুক সময়ে আসুন, দেখিয়ে দেব। লিখিত আকারে তথ্য চাইলে তার জন্য লিখিত জমা দিতে হবে। আইনটি এমনভাবেই রচিত।

দীর্ঘ দিনের অভ্যাস হেতু সরকারি দপ্তরে নিযুক্ত বয়-বাবু-সাহেবদের অনেকে এখনও এই আইনটির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। সেজন্য অসুবিধে হচ্ছে। তথ্য পেতে হয়রান হতে হচ্ছে। এজন্য কয়েকটি রাজ্যে কিছু অফিসারের জরিমানাও হয়েছে। তাই বলছি দুর্নীতি রোধে সাধারণ মানুষের হাতে একটি শক্তিশালি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এই আইন।

সরকারি কাজে গোপনীয়তার কিছু নেই। সবাই সব কিছু জানার বা বুঝে নেওয়ার অধিকারি। এই স্পিরিটটাকে পঞ্চায়েতের কাজ-কর্মে কাজে লাগাতে হবে। গ্রাম সভায় এই ব্যাপারে সহমত গড়ে তুলতে হবে। তাহলে সত্যি -মিথ্যা যাই হোক গ্রাম জীবনে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে লোকমনে সর্বদাই যে একটা অবিশ্বাস এবং চাপা অসন্তোষের ভাব থাকে তার অবসান হবে। পঞ্চায়েতের আয়ব্যয়ের হিসেব, কী কী কাজ হবে বা হল, কারা কারা কাজে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত, কে কত মজুরি পেল সব লিখে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এই নিয়ে অযথা ধোঁয়াশা বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কেউ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে সবাই সে খবর জানতে পারবে। সেই মত সংশোধনের দাবী করতে পারবে।

তথ্য টাঙিয়ে দেবার প্রথা কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু কেন্দ্রীয় সংস্থায় চালু হয়ে গেছে। সংস্থার ওয়েবসাইট ঘাঁটলেই সেটা দেখা যায়। সংস্থার কর্মীরা কে কী পোষ্টে কাজ করে, কে কত মাইনে পায় সে তথ্য অবধি দেওয়া থাকছে। গোটা দেশের যেকেউই যেকোনো সময় বাড়ি বসেই সংস্থার ওয়েবসাইট খুলে সেসব তথ্য দেখে নিতে পারে। ফলে সরকারি দপ্তরের কোনো কাগজপত্রই গোপন দলিল নয়।

রোজগার প্রকল্পের নানান স্তরে দুর্নীতি, চুরি ইত্যাদি ঠেকানর ব্যাপারে এই আইনটিকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এমন যে একটা সুযোগ আছে সে ব্যাপারটাই এখনও সবাই জানে না। সেটাই এখন সবাইকে জানানর উদ্যোগ নিতে হবে। এই নিয়ে প্রচার চালাতে হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে আইনের কপি লোকের হাতে হাতে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। রাজ্যে রাজ্যে কীভাবে সাধারণ মানুষ এই আইনের সাহায্য নিচ্ছেন সেই দৃষ্টান্তও তুলে ধরা যায়। তবেই লোকের মনে এর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং আইনটি

ব্যবহারের ব্যাপারে উৎসাহী হবে।

### গ্রামসভা কার্যকর হওয়ার পরিস্থিতি আছে কী

অভিজ্ঞ লোকেরা বলবেন এই রাজ্যে ওই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের পরিস্থিতিই নেই। গ্রামের মাতব্বরদের দুর্নীতি আর দলবাজী আজ ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গঞ্জে। প্রথম সাহস দেখিয়েছিল কলকাতার অদূরে অবস্থিত সিঙ্গুরের মানুষ। টাটার মোটর গাড়ির কারখানার জন্য জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে। পরে সেই সাহস ছড়িয়ে পড়ে নন্দীগ্রামে। সেখানে কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি দখলের নোটিশ টাঙানর সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে মানুষ। সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। সি পি এম-এর ক্যাডার বাহিনী খুন-খারাপি ও সন্ত্রাস চালিয়ে এর বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভয় ভীতি সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়েও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মানুষ নিঃশব্দে তার জবাব দিয়েছে ভোটের বাক্সে। ক্ষমতাদর্পী সিপিএম পার্টির পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিয়েছে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষ। অল্প কিছুদিন আগেও সিপিএম-এর অতি বড় শত্রুও এই পরিণতির কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু ঘটেছে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পথ দেখিয়েছে। এবার জেগে উঠেছে আদিবাসী সাঁওতাল শবর লোধা ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষ। শালবনী-বিস্ফোরণ কান্ডের পর মাওবাদী ধরার নামে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। বিক্ষোভ আন্দোলন লালগড়, বীনপুর, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে আরও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তা কেটে ফেলে পুলিশ ও প্রশাসনের গ্রামে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেয় তারা। ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশ, প্রশাসন ও সিপিএম পার্টির বিমূঢ় অবস্থা। নন্দীগ্রামের মত এখানেও মোটর-সাইকেলবাহী বন্দুকধারী পার্টি-ক্যাডারদের লেলিয়ে দেবার সাহস হচ্ছে না আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তাদের। মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় বলতে হয়েছে আদিবাসী মহিলাদের ওপর পুলিশী হামলার জন্য তিনি লজ্জিত!

এক বছর আগেও এই রাজ্যের কেউ কল্পনাও করতে পারতো না এই পরিস্থিতি। বন্দুক না উঁচিয়ে কথা বলে না যে পুলিশ ও প্রশাসন, তারা প্রায় যেকোনো শর্তে আন্দোলনকারিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসায় রাজি আজ। তাই বলছিলাম পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। আগামী দিনগুলি আর আগের মত নাও থাকতে পারে। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হলে এবং চাইলে পঞ্চায়েত ও গ্রামসভার কাজকর্মের পদ্ধতি বদলে দিতে পারে। সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

### পৌঁছতে হবে এদের কাছে

এখন প্রশ্ন কে বা কারা এইসব তথ্য পৌঁছে দেবে মানুষের কাছে? রোজগার-প্রকল্পের বিষয় এবং তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের খুঁটিনাটি বিষয়। জেলার পত্র-পত্রিকাগুলি প্রাথমিকভাবে প্রচারের কাজটা করতে পারে। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা জনকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও প্রচারের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। আর পারে রাজনৈতিক কর্মীরা। যারা গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছাকাছি অবস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। বিগত দুস্বছরের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যের বেশিরভাগ পঞ্চায়েত এই প্রকল্প কার্যকর করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে গড়ে পরিবার পিছু মাত্র ১৮ দিন কাজ পেয়েছিল। ফলে বরাদ্দ অর্থের বেশির ভাগই ফেরৎ গেছে। অথচ কাজ না জোটাতে পেরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কেটেছে এই রাজ্যের বহু মানুষের। দৈনিক পত্রিকায় তার খবর আমরা দেখেছি। অথচ অনায়াসে কিছু কাজ জুটিয়ে দিয়ে এদের জন্য কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত করা যেত। টাকার অভাব ছিল না। যে লালগড়ে মানুষকে আজ পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে দেখা যাচ্ছে সেটা নিছক পুলিশের বিরুদ্ধেই জেহাদ এমন মনে করার কারণ নেই। ক্রমাগত বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার সেখানকার মানুষ। এদের একটি জীবিকা হল শালপাতার থালা বানান। দিনে রোজগার কুড়ি-পঁচিশ টাকার মত। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এখানকার মানুষ রোজগার যোজনায় কাজ পেয়েছে গড়ে মাত্র চার থেকে পাঁচ দিন এবং সেই কাজের জন্য মজুরি পেয়েছে দৈনিক মাত্র ত্রিশ টাকার মত! অথচ সত্তর থেকে আশি টাকা পাওয়ার কথা তাদের। বাকি টাকা উবে গেছে।

পঞ্চায়েতের এই দুর্নীতি ও অপকীর্তির কথা মানুষকে জানানই একটা বড় কাজ। তাহলে ন্যায্য মজুরিতে কাজের দাবীতে গড়ে উঠতে পারে আন্দোলন।

**সরকারি প্রকল্প ব্যবহারের পক্ষে কথা বলা মানেই স্থিতাবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো নয়**

সরকারি প্রকল্পের সপক্ষে সওয়াল করায় অনেকের অনীহা থাকবে। বিশেষ করে বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকেদের। তাদের কাছে এটা রিফরমিস্ট কাজ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই তাই কিনা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। প্রকল্পটা সরকারের ঠিকই। কিন্তু কাজের দাবী তো অধিকার আদায়ের দাবী। রাজনৈতিক কর্মীরা তো এমন দাবী আদায়ের জন্যই লড়াই করে। নিছক সমাজ বদলের দাবী নিয়ে তো আর আন্দোলন হয় না। শুধু এজন্যই আন্দোলনে সামিল হয় কারা বা কজন? মানুষ তার নিজের পাওনা দাবীদাওয়া আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনে সামিল হয়। তা না হলে সমাজ বদলের দাবীর মত বিমূর্ত ধারণায় পৌঁছবে কীভাবে মানুষ? তবু যারা পৌঁছন, তারা মাথা খাটিয়ে পৌঁছন। যেমন পেশাদার রাজনীতিকরা। রিফরমিস্ট দাবি আদায়ের জন্যই আন্দোলনটা সাজায়, খুব বেশি হলে ভোটে জেতা পর্যন্ত ভাবে। সেই একই দাবি নিয়ে যখন বামপন্থীরা আন্দোলন করে তখন তারা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সমাজ বদলের চেতনায় মানুষকে উন্নীত করার চেষ্টায় সতত ব্রতী এবং সক্রিয় তার উপযুক্ত সংগঠনের সন্ধান ও নির্মাণে।

রোজগার যোজনার কর্মসূচি কার্যকর করার দাবীর মধ্য দিয়ে আগামীদিনের উপযোগী রাজনীতির জন্ম হতে পারে। যে রাজনীতির লক্ষ্য হবে নীচের তলার মানুষের ক্ষমতায়ণ। কাজের অধিকার অর্জনের পথে বাধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই হোক সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক কর্মের শিক্ষা। এই রাজনীতিতে যে দল অংশ নিতে চাইবে তাকে মনোভাব বদলাতে হবে। তাদের বলতে হবে যে তারা মানুষের আন্দোলনের পেছনে আছে। জনগণ তাদের পেছনে আছে বলার অভ্যাস ছাড়তে হবে। মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সহায়তা দেবার মনোভাবই হোক আগামী দিনের রাজনীতির স্পিরিট।

**বর্তমানের রোজগার আইনটি যথেষ্ট নয়, এর সংশোধন চাই**

বর্তমানের এই রোজগার প্রকল্প বিষয়ের আইনটি যথেষ্ট নয়। এর সংশোধন চাইতে হবে। যেমন একশ দিন নয়, দাবী তুলতে হবে সারা বছরের জন্য কাজের নিশ্চয়তা চাই। আর কেনইবা এই প্রকল্প কেবল গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে? শহরময় ছড়িয়ে আছে অজস্র হাতে কাজ না থাকা দরিদ্র মানুষ। এদেরও ৭৪ নং সংশোধনী মারফৎ এই প্রকল্পের আওতায় আনার দাবী তুলতে হবে। আবার দারিদ্র সীমার নীচের মানুষেরাই রোজগার যোজনার কাজ পেতে পারবে এই বিধিটিরও পরিবর্তন চাইতে হবে। যে চাইবে তাকেই কেন কাজ দেওয়া হবে না? অন্যত্র কাজ না পেলেই তো লোকে কাজ চাইতে আসবে। সরকার নির্দ্ধারিত দারিদ্র সীমার ভিত্তি ও নথিকরণ নিয়েই বিস্তর প্রশ্ন আছে। ফলে ওই নিয়ে ফ্যাঁকড়া রাখার দরকারটা কী?